৯.১.২. ফরাজী আন্দোলন

ফরাজীরা ছিল হাজি শরিয়তুল্লা প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠী। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জ জেলাগুলিতে দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের মধ্যে ফরাজী-ধর্মীয় মতাদর্শ অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শরিয়তুল্লা ফরিদপুর জেলার শিবচুর থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে সম্ভবতঃ একটি জোলা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৮ বছর বয়সে হজ্ব করার জন্য মক্কা যান এবং সেখান ওয়াহাবী মতাবলম্বীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৮২০ খৃঃ নাগাদ তিনি দেশে ফেরেন এবং ঐস্লামিক আদর্শ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির কথা মুসলিমদের

সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে প্রচার করতে থাকেন। ফরাজীদের সম্পর্কে জেমস্ ওয়াইসের (James Wise) আলোচনা থেকে জানা যায় যে কোরাণ অনুমোদন করে নি এরকম যাবতীয় উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ ফরাজীরা বর্জন করেছিলেন। শরিয়তুল্লা তাঁর অনুগামীদের বেশকিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটিতে বেশ অভিনবত্ব ছিল। এই নির্দেশে বলা হয়েছিল যে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষ যেহেতু 'দার-উল-হারব' বা শত্রুর দেশে পরিণত হয়েছে সেহেতু ফরাজীরা তার প্রতিবাদে শুক্রবার নামাজ পড়বেন না এবং বছরে দুটি ঈদের অনুষ্ঠান পালন করবেন না। তিনি মুসলিমদের হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিতেও নিষেধ করেছিলেন। জনৈক ইংরেজ প্রশাসক জেমস্ টেলর ১৮৪০ খৃঃ তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন—"ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ জেলাগুলিতে ফরাজী গোষ্ঠীর প্রভাব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আদৌ সহনশীল নয়। তারা মাঝে-মধ্যেই ঢাকা শহরে গোলমাল পাকাচ্ছে। এই কারণে তাদের নেতা শরিয়তুল্লাকে একাধিকবার হাজতে ভরা হয়েছে। সম্প্রতি কৃষকদের খাজনা না দিতে বলার জন্য পুলিশ এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।" শরিয়তুল্লার নির্দেশ এবং টেলরের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্টই ধরা পড়ে যে ফরাজী মতাদর্শ একটি ধর্মীয় গণ্ডীর সীমানা অতিক্রম করে একটি রাজনৈতিক রূপ নিতে শুরু করেছিল।

জেমস্ ওয়াইসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ফরাজী মতাদর্শের প্রসার স্থানীয় জমিদারদের আতঙ্কিত করেছিল। ফলে মুসলিম কৃষকদের মধ্যে ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে এই জেলাগুলিতে অধিকাংশ কৃষকই ছিলেন মুসলমান এবং তাঁরা প্রধানতঃ হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের শিকার হতেন। তাছাড়া যে নীল আবাদকারী সাহেবরা কৃষকদের বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করতেন, তাঁদের প্রায় সমস্ত সহযোগী গোমস্তাই ছিলেন হিন্দু। ১৮৫০ খৃঃ ১লা জানুয়ারী শরিয়তুল্লার পুত্র দুদু মিঞা, যিনি পিতার মৃত্যুর পর ফরাজী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ইংরেজ সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান। এই আবেদনপত্রে মুসলিম মানসিকতার স্বরূপ স্পষ্টভাবেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। দুদু মিঞা লিখেছিলেন—পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন হিন্দু জমিদার মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে দশেরা ও অন্যান্য পূজা উপলক্ষে জোর করে টাকা আদায় করেন, যা মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী। দুদু মিঞা আরও বলেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত জমিদারই রায়তদের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং রায়তদের ওপর অন্যায্যভাবে জরিমানা ধার্য করেন। জরিমানা দিতে বিলম্ব করলে জমিদারেরা রায়তদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতেন। দুদু মিঞার ভাষ্য থেকে আরও জানা যায় যে "শুদ্ধ মুসলমানেরা" এই অবৈধ জরিমানা দিতে অস্বীকার করতেন এবং তখন তাঁদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ হত। অকথ্য নির্মম অত্যাচার চালানো ছাড়াও জমিদারেরা রায়তদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁদের প্রায়ই ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে দিতেন।

বারাসতের ওয়াহাবী আন্দোলনের মতই ফরাজী আন্দোলনও একটি জমিদার বিরোধী ও নীলকর বিরোধী জঙ্গী চরিত্র ধারণ করেছিল; যদিও ওয়াহাবীদের মতই তিতুতার সূত্রপাত হয়েছিল ধর্মীয় বিরোধকে কেন্দ্র করে। ফরাজীরাও একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাই শরিয়তুল্লা তাঁর

অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন—এই বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন আচার বা প্রথা তাঁরা যেন গ্রহণ না নেন। অথচ আমরা দেখেছি হিন্দু জমিদাররা প্রায়ই হিন্দু পূজাপার্বণের জন্য মুসলমান রায়তদের থেকে আবওয়াব আদায় করতেন। ফরাজীরা এই ধরনের আবওয়াব দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে মূর্তিপূজার জন্য টাকা দেবার অর্থ তাঁদের ঈশ্বরের অখণ্ডতার বিশ্বাসকে আঘাত করা। ঐতিহাসিক বিনয়ভূষণ চৌধুরী যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন—"ফরাজীদের এ প্রতিবাদের তাৎপর্য শুধুমাত্র জমিদারের আর্থিক ক্ষতি নয় ; এটা আসলে জমিদারী এলাকায় তাদের দীর্ঘদিনের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের উপর আঘাত।" প্রকৃতপক্ষে জমিদার, নীলকর প্রভৃতি শক্তিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ফরাজীদের সংঘর্ষে যাওয়ার কতকগুলি কারণ ছিল। এই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা বলেছেন—ফরাজীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমিদারী শোষণ ব্যবস্থা ও নীলচাষ প্রথার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো। এ প্রসঙ্গে দুদু মিঞার একটি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। দুদু মিঞা বলতেন—"জমি ভগবানের দান ; এতে জমিদারের ব্যক্তিগত মালিকানা ভগবৎ বিধান বিরোধী।" সমসাময়িক সরকারী নথিপত্রেও ফরাজীদের এই "বিশেষ প্রিয় বিশ্বাসের" উল্লেখ রয়েছে। এই বিশ্বাস থেকেই দরিদ্র ফরাজী কৃষকেরা যেকোন ধরনের খাজনা দিতে অপছন্দ করতেন এবং সেই সুদিনের স্বপ্ন দেখতেন যেদিন তাঁদের কোনরকম খাজনা দেবার দায় থাকবে না।

১৮৩৮ খৃঃ দুদু মিঞা তাঁর অনুগামী কৃষকদের জমিদারী খাজনা দিতে নিষেধ করেন এবং নীলকর সাহেবদের কথামতো নীলচাষ করতে বাধ্য না হবার নির্দেশ দেন। তখন থেকেই ফরাজী বিদ্রোহীরা ফরিদপুর অঞ্চলের নীলকুঠিগুলি আক্রমণ করে ধ্বংস করতে শুরু করেন। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ নীলকুঠিরই মালিক ছিলেন ডানলপ নামে এক ইংরেজ। মুইনুদ্দিন আহম্মদ খাঁ তাঁর *History of the Faraiji Movement in Bengal* গ্রন্থে বলেছেন হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যয়-নির্বাহের জন্য ফরাজীদের ওপর যে আবওয়াব ধার্য করা হত, তার বিরুদ্ধে ফরাজীদের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। এছাড়াও মুইনুদ্দিন আহম্মদ খাঁ তাঁর গ্রন্থে জমিদারী নির্যাতন ও উৎপীড়নের নানা কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৮৩৯ খৃঃ ৭ই এপ্রিল ফরিদপুরের যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রতিবেদনে বলেছিলেন—শিবচর থানায় প্রায় সাত-আট হাজার লোকের একটি জমায়েত হয়েছে। যোগদানকারীদের অধিকাংশই হাজী মুসলমান সম্প্রদায় এবং দরিদ্র রায়ত শ্রেণীর লোক। যশোর ও বাখরগঞ্জের হাজীরাও এই সমাবেশে যোগ দেন। এই সমাবেশেই ফরাজীরা দুদু মিঞাকে তাঁদের নেতা নির্বাচন করেন। সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে সমাবেশে যোগদানকারী ফরাজীরা পুলিশের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন এবং শিবচর থানার দারোগাকে তুচ্ছ দেখিয়েছিলেন। দুদু মিঞার আন্দোলনের অন্যতম অভিনব বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে—ফরাজীরা নিজস্ব আইন প্রণয়ন করেছিলেন এবং তাঁদের নিজেদের আদালত ছিল। তাঁরা সরকারী আদালতগুলিকে বর্জন করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফরাজী আদালতগুলির বিচারকদের বলা হত মুন্সী। এক-একজন মুন্সীর এক্তিয়ারে দু-তিনটি গ্রাম থাকত। মুন্সী ফরাজীদের দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করতেন। ঐতিহাসিক শশীভূষণ চৌধুরী তাঁর *Civil Disturbances during British rule in India* গ্রন্থে বলেছেন ফরাজীদের আদালতগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, কারণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরাই মনে করেছিলেন

যে এই আদালতগুলি তাঁদের জমিদারী উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করবে।

দুদু মিঞা এবং তাঁর অনুগামীরা ফরাজী ধর্মীয় মতাদর্শের বিরোধীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালানোকে, এমন কি তাদের হত্যা করাকেও কোন 'পাপ' বলে মনে করতেন না। ফরাজীদের যে বিচার হয়েছিল, সেই বিচার-সংক্রান্ত নথিপত্র প্রমাণ করে, যেসব মানুষ জমিদারদের আশ্রয় গ্রহণ করত তাদের বা অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ফরাজীরা সাধ্যানুযায়ী আঘাত করতে কুণ্ঠিত হতেন না। দুদু মিঞার নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ফরাজী রাজ কায়েম করা হয়েছিল। দুদু মিঞা কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মকানুন চালু করেছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গকে কতকগুলি বিভাগে (circle) বিভক্ত করেন। প্রতিটি বিভাগে তিনি একজন করে খলিফা নিযুক্ত করেন। খলিফারা নিজ নিজ এলাকার খবরাখবর সংগ্রহ করে দুদু মিঞাকে জানাতেন। অনুগামীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এই অর্থকে বলা হত ফরাজী কর। ফরাজী কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সরকারী আদালতে দরিদ্র কৃষকদের হয়ে মামলা লড়ার এবং ফরাজী আন্দোলন চালানোর ব্যয় নির্বাহ করা হত।

নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে ফরাজীদের আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছিল। ফরিদপুর অঞ্চলের অধিকাংশ নীলকুঠির মালিক ডানলপ ফরাজীদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের সাহায্য নিয়ে দুদু মিঞার বাড়ী লুণ্ঠন করেন ও ধ্বংস করেন। দুদু মিঞা প্রতিশোধ-প্রবণ হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে ডানলপের মালিকানাধীন একটি নীলকুঠি অগ্নিদগ্ধ করেন ও সেই নীলকুঠির গোমস্তা কালি কাঞ্জীলালকে হত্যা করেন। এই অপরাধে দুদু মিঞাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে। সরকারী তদন্ত স্পষ্টই প্রতিপন্ন করেছিল যে দুদু মিঞা ডানলপের যতটা ক্ষতি করেছিলেন তার থেকে ডানলপ দুদু মিঞার অনেক বেশী ক্ষতিসাধন করেছিলেন। বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে দুদু মিঞা বলেছিলেন যে নীলকর সাহেবরা তাঁর সম্পত্তি, বাড়ি, জমি, তালুক এবং জীবন ধ্বংস করেছে। যে বিচারক দুদু মিঞার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার করেছিলেন, তিনি বিচারের রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছিলেন—"নীল আবাদকারীরা ধারাবাহিকভাবে রায়তদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। তাদের ব্যবস্থায় পার্থিব কোন ম্যাজিস্ট্রেটের বা স্বর্গীয় কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। সাধারণ বিচার বলে কিছুই নেই। ডানলপের নীলকুঠির ধ্বংসসাধন সাধারণ বিচারকে অগ্রাহ্য করারই পরিণতি" (The land of the planter systematically lifted up against the life and property of a raiyat; a system that appeared to me neither the existence of a magistrate on earth, nor a God in heaven. I found a total absence of ordinary justice.....The outrage on Mr. Dunlop's factory originated in the total denial of ordinary justice.)। তদন্তকারী সরকারী কর্মচারীরা দুদু মিঞার বিরুদ্ধে "বেআইনী কার্যকলাপ" (lawless conduct) এবং "বিপজ্জনক মতবাদ" (dangerous doctrine) প্রচারের অভিযোগ এনেছিলেন। শেষপর্যন্ত বিচারে ১৮৪৮ সালে দুদু মিঞার ওপর জরিমানা ধার্য করা হয় এবং তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে দুদু মিঞা একটি উল্লেখযোগ্য নাম। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তিনি পূর্ববঙ্গের এক বিতর্কিত চরিত্র হিসাবে প্রতিভাত ছিলেন। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, ঢাকা,

পাবনা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার ঘরে ঘরে দুদু মিঞার নাম উচ্চারিত হত। ফরাজীরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রাথমিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁরা কিছুটা সাফল্যও লাভ করেছিলেন। যদিও শেষপর্যন্ত তাঁরা কোম্পানি সরকার, নীলকর সাহেব, জমিদার-মহাজনের সম্মিলিত শক্তিজোটের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। ফরিদপুরের যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রতিবেদনে দুদু মিঞার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছিলেন—"দুদু মিঞা নীতিজ্ঞানহীন জমিদারদের মতো পেছনে বসে কলকাঠি নাড়তেন না। তাঁর অনুগামীরা যখন লুণ্ঠন চালানোর কর্মসূচী নিতেন, তখন তিনি অগ্রভাগে থেকে তাঁদের নেতৃত্ব দিতেন" (All who have any experience of the Farajis must be well aware that unlike unprincipled zamindars who generally keep themselves in background, Dudu Miyan always was either present or close at hand during all the principal acts of plunder committed by his followers.)।

১৮৬২ খৃঃ দুদু মিঞা ঢাকায় দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেও ফরাজী আন্দোলন চলেছিল। ফরাজী কার্যকলাপের পুরনো কেন্দ্রগুলিতে ফরাজীরা বিক্ষিপ্তভাবে তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন—"দুদু মিঞার মৃত্যুর পর..... দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে দুদু মিঞা ও তাঁহার ফরাজী মতবাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।" কিন্তু শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়। আন্দোলনের নেতাদের অস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা এবং সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা সংগ্রামকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাছাড়া ফরাজীরা দুদু মিঞার বিকল্প কোন যোগ্য নেতা গড়ে তুলতে পারেন নি। দুদু মিঞার একক নেতৃত্বে পরিচালিত এই গণসংগ্রাম দুদু মিঞার দীর্ঘ কারাবাসের ফলে বারবার নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল। এই নেতৃত্বহীন বিদ্রোহীদের দমন করা ইংরেজ সরকার, নীলকর সাহেব ও জমিদারদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। তবে নোয়া মিঞার নেতৃত্বে ফরাজীরা ১৮৮০-র দশক পর্যন্ত ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও মালদায় জমিদার-বিরোধী কৃষক-বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিলেন।

নরহরি কবিরাজ লিখেছেন—ফরাজীদের শক্তির প্রধান উৎস ছিল ধর্মীয় ঐক্য। একটি বিশেষ মুসলিম গোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনা ক্রমে দরিদ্র কৃষকদের প্রভাবিত করেছিল এবং ধর্মভিত্তিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ফরাজীরা মনে করতেন সরকারকে কর দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু জমিদারকে খাজনা দেওয়া যাবে না। তাই তাঁরা সরকারী খাসমহাল ও চর এলাকাগুলিতে জমিচাষ করতে পছন্দ করতেন। ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ডানবার বলেছিলেন—ফরাজীরা এলাকার আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করছে। তাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে ফরাজীদের দমন করার জন্য তিনি সরকারী হস্তক্ষেপ সুপারিশ করেন। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ফরাজী আন্দোলনকে দমন করেছিল, কিন্তু ভারতের গণসংগ্রামের ইতিহাসে ফরাজী বিদ্রোহ একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।